সফলতার সন্ধানে

তাফাজ্জুল হক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সফলতা ও ব্যর্থতা **১১**

সফলতার সন্ধানে ১১

ব্যর্থতার প্রকৃত অর্থ ১৫

মনে মনে সফল ১৭

অকর্মার আত্মবিশ্বাস ১৯

মূর্খদের কাছে সফল ২০

যে বিষয়গুলো অবশ্য-বর্জনীয় ২১

হঠাৎ করে কোনো কাজ করতে যাওয়ার ক্ষতিকর দিক ২২

জনদরদি, সর্বজনপ্রিয় ২৩

আদর্শ ব্যক্তির কিছু গুণ ২৪

সম্পর্কের জটিলতা ২৫

কথা বলা ও না বলা ২৮

প্রচারণার উপকার ও অপকার ২৯

কাজকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে নাও ৩২

উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের একটি দৃষ্টান্ত ৩৩

সময় বাঁচানোর নামে নিজের ওপর জুলুম ৩৫

সুবিধাবাদী ব্যক্তি সফল হতে পারে না ৩৬

কাজের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকার ৩৭

সফল ব্যক্তিদের কাজ ৩৮

কিছু মানুষ তোমার ব্যর্থতার গল্পের ভূমিকা লিখে রেখেছে ৩৯

কিছু বিরক্তিকর চরিত্র ৪০
প্রতিটি কাজের আলাদা মানুষ দরকার ৪১
উদ্যম ফিরিয়ে আনতে করণীয় ৪১
জানার পরিধি বাড়ানো ৪৫
যে মানুষগুলো অবশ্যই হারিয়ে যাবে ৪৬
যেটা সহজেই সবাই মেনে নেয়, সেটা সহজে ছেড়েও দেয় ৪৭
তোমার প্রতিটা দিন তোমাকে প্রমাণ করছে ৪৮
কিছু হওয়া বনাম কিছু করা ৪৯
যে বিষয়গুলো আগে জেনে নেওয়া উচিত ৫০
চাহিদা তৈরির গুরুত্ব ৫৩
কর্মীর চেয়ে পরামর্শদাতা বেশি হয়ে গেলে ৫৫
নিজস্বতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ৫৬
দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম ৫৭
পরিশ্রম না করেই ফলাফলের আশা ৫৭
যখন নতুন কাজে জড়ানো প্রয়োজন ৫৮
শেষ হাসিটা তুমিই হাসবে, তবে... ..... ৫৯
তোমার সফলতা যেন কারও ব্যর্থতার ওপর নির্ভর না করে ৬০
যোগ্যতার অভাব অনেক সময় আত্মঘাতী হতে বাধ্য করে ৬১
মেধার স্বল্পতা নয়, নিষ্কর্মা হওয়াই মূল সমস্যা ৬১
আমি কি সেটাকেই গুরুত্ব দিলাম? ৬৩
স্বীকৃতি সাফল্যের চাবিকাঠি নয় ৬৪
প্রভাবিত হওয়া ৬৫
ঝুঁকি নেওয়া ৬৭
যেসব সংকীর্ণ চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ৬৯
লক্ষ্যহীন মানুষ মানসিক যাতনায় ভোগে ৭০
সফলতা যখন অন্যের ওপর নির্ভর করে ৭১
অতিরিক্ত উদ্দীপনা ভালো কিছু নয় ৭২
কাউকে সঙ্গ দেওয়ার অর্থ ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিকূল পরিবেশে করণীয় **৭৪**
নিজের সম্পর্কে মনোভাব ৭৪
ওদের সম্পর্কে মনোভাব ৮০
যেগুলো তোমার দুর্বলতা নয় ৮৩
দুশ্চিন্তা ও তার প্রতিকার ৮৪
অবহেলার জবাব ৮৮
সমস্যা সৃষ্টিকারী কয়েক শ্রেণির মানুষ ৯০
ব্যর্থতা কিংবা ব্যর্থতার ভয় মানুষকে আত্মঘাতী করে তোলে ৯১
কঠিন মুহূর্ত ফেইস করার জন্য কেউ তোমার সঙ্গ গ্রহণ করেনি ৯২
অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না ৯৫
মন্তব্য যেন গন্তব্য না থামায় ৯৬
বারবার কারও পানে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়? ৯৮
সমস্যার গোলাম হবে না ১০০
অন্যের কাজ নিয়ে গবেষণা নয়, নিজে কাজ করো ১০১
নেতৃত্বের জন্য যে-পথগুলো পাড়ি দেওয়া চাই ১০৩
যে শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকে, সে আসলে মৃত ১০৪
একটি ফলাফলপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে যেতে হলে ১০৪
মাধ্যম ও উপকরণের অভাব ১০৬
যে জায়গাগুলোতে মানুষকে অপারগ মনে হয় ১০৭
কত প্রয়োজন ছিল ওদের চলে যাওয়ার ১০৯
এগিয়ে যাওয়ার মোক্ষম সময় ১১০
চিন্তা ও গভীরতার অভাব ১১১
কর্মের মাধ্যমে জবাব দেওয়াও উচিত নয় ১১৩
আমাদের প্রতিযোগিতাটাই ভুল ১১৪
পিছুটান ১১৫
মানুষকে জানা ১১৬

প্রথম অধ্যায়
সফলতা ও ব্যর্থতা

সফলতার সন্ধানে

লক্ষ্য ছাড়া কোনো মানুষ সফল হতে পারে না। কারণ সফলতা হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের চূড়ায় পৌঁছার নাম। সুতরাং যার লক্ষ্য নেই, তার সাফল্য বলতে কিছুই নেই। সামনে চলে আসা কোনো কাজের চূড়ান্তে পৌঁছাকে আমরা সে-কাজের সমাপ্তি বলতে পারি; সফলতা নয়। কোনো কাজের সমাপ্তিকে প্রকৃত অর্থে সফলতা বলার জন্য প্রয়োজন সে-কাজের পেছনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা।

লক্ষ্য, সফলতা ও স্বপ্ন সম্পর্কে *'দ্য পাওয়ার অব পজিটিভ থিংকিং'* বইয়ে বলা হয়েছে—'আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্নগুলোও বাস্তবে পরিণত হতে পারে, শুধু আপনি যদি জানেন যে, আপনার লক্ষ্য কী এবং কোথায়। আপনার প্রত্যাশার অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। অনেক মানুষই সাধারণ কোথাও পৌঁছতে পারে না—কারণ তারা জানে না যে, তারা কোথায় যেতে চায়। তাদের কোনো পরিষ্কার ও সঠিকভাবে নির্ধারিত উদ্দেশ্য নেই। আপনার চিন্তা যদি লক্ষ্যহীন হয়, তবে সবচেয়ে ভালো কিছু আপনি আশা করতে পারেন না।

অধিকাংশ লোকের ব্যর্থতার মূল কারণ এটাই। তারা কখনও কাঙ্ক্ষিত কোথাও পৌঁছতে পারে না—কারণ তারা কোথায় যাবে, কী করবে—সে বিষয়ে তাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তাই তাদের কোনো উদ্দেশ্যই সুন্দর পরিণতি লাভ করতে পারে না।'[১]

[১] ড. নরম্যান ভিনসেন্ট, দ্য পাওয়ার অব পজিটিভ থিংকিং, পৃষ্ঠা : ১৩১।

উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের একটি দৃষ্টান্ত

সাফল্যের জন্য খুব জরুরি একটি বিষয় হলো, আত্মবিশ্বাস। যে-কোনো কাজের চূড়ান্তে পৌঁছার আগপর্যন্ত হাল না ছাড়ার মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এটাই সফল ব্যক্তিদের সাফল্যের মূল রহস্য। বিজয়ী মানুষ কীভাবে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে থাকে, তার একটা উদাহরণ দেখো—

তরুণ সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহর নেতৃত্বে উসমানীরা যখন কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করে, তখনকার বিবরণ ইতিহাসের পাতায় এভাবে এসেছে—

'১৩ ও ১৪-ই মে উসমানী নেতৃবৃন্দ যেসব প্রস্তাবনায় একমত হয়েছিল, গত পাঁচ দিনে তার সবগুলোই বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ পরিকল্পনাই ব্যর্থতার শিকার হয়েছে। যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়েছিল, বাইজেন্টাইনরা সেদিনই তা ধ্বংস করে দিয়েছে। কাঠের টাওয়ারও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। উসমানী নৌবহরের জাহাজগুলো লৌহ-জিঞ্জির অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। ওদিকে ভাসমান সেতু বেশি ভারী কামানগুলো ধারণের উপযুক্ত নয়। তাই সেতুর ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলো প্রাচীরের জন্য কার্যকর হুমকি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে না।

তাহলে কি এসব ব্যর্থতায় উসমানী বাহিনী হতাশ-হতোদ্যম হয়ে পড়বে?

বাস্তবতা হলো, এমনটি কখনোই ঘটেনি। বরং, পুরো বাহিনী এরপরও এমন ধৈর্য, অধ্যবসায় ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে থাকে যে, মনে হচ্ছিল তারা কখনও কোনো ব্যর্থতারই শিকার হয়নি। তারা যেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালাচ্ছিল, একবার ব্যর্থ হওয়ার পরই তা বাদ দিচ্ছিল না; বরং ফলাফল ও কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পরই কেবল তা অকার্যকর বিবেচনা করে পরিত্যাগ করছিল।

উদাহরণস্বরূপ সুড়ঙ্গ খননের কথাই ধরা যাক। ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে, উসমানী বাহিনী একটি-দুটি সুড়ঙ্গ খনন করেনি; তারা গুনে গুনে

১৪টি সুড়ঙ্গ খনন করেছিল। পাথুরে ভূমির প্রকৃতি যদি বিবেচনায় রাখা হয়, সঙ্গে এ-বিষয়টিও মনে রাখা হয় যে, বাইজেন্টাইনদের কাছে গোপন রাখার জন্য নগরপ্রাচীর থেকে অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে সুড়ঙ্গ খননের চেষ্টা করা হচ্ছিল, তাহলে অনুধাবন করা যাবে যে, এর জন্য কী বিপুল পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল!

এত কঠিন পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের পরও একটি সুড়ঙ্গও নগরীর অভ্যন্তরে পৌঁছতে পারেনি। কাঠের টাওয়ারের কথা বলতে গেলে, উসমানী বাহিনী বেশ কয়েকটি কাঠের টাওয়ার তৈরি করে—কিন্তু বাইজেন্টাইনরা কয়েকটি টাওয়ার জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়। বাধ্য হয়ে উসমানীরা বাকি টাওয়ারগুলো সরিয়ে পেছনে নিয়ে আসে।

উসমানী নৌবহর যদিও জানত যে, লৌহ-জিঞ্জির অতিক্রম করা কার্যত অসম্ভব একটি কাজ, কিন্তু তারপরও ২১-মে তারা আরেকবার একই চেষ্টা চালায়। এবারও আগেরবারের মতো পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা চালানো হয়।[২] উসমানী

---

[২] তবে লৌহ-জিঞ্জির অতিক্রম করে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে সুলতান মুহাম্মাদ এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেন। গোল্ডেন হর্নের উত্তরে গালাতার স্থলপথে গাছ কেটে চর্বি ও তেল মাখিয়ে পিচ্ছিল করার নির্দেশ দেন সুলতান। নৌপথের বদলে সেই স্থলপথ দিয়ে এক রাতের মাঝে প্রায় ৭০টি জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গোল্ডেন হর্নে। গালাতা অতিক্রম করে গোল্ডেন হর্নের দিক থেকেও উসমানীয় বাহিনীর করা অবরোধের প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহরের স্থলভাগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে পরাজয় ত্বরান্বিত হয় বাইজেন্টাইনদের। মুসলিমদের হাতে বিজিত হয় হাদিসে প্রতিশ্রুত অজেয়-খ্যাত ঐতিহাসিক শহর কনস্ট্যান্টিনোপল। পতন হয় একসময়ের পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন বা পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের। উন্মোচিত হয় মুসলিমদের বিশ্ব শাসনের নবদিগন্ত।

নিঃসন্দেহে এ-দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সফলতা এসেছিল আল্লাহর দয়ায়; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বোঝার কথা, এ-সফলতা অর্জনে সেই সৌভাগ্যবান বাহিনীর সেনাদের কী অসম্ভব রকমের পরিশ্রম করতে হয়েছিল! কতটা দৃঢ়চেতা ও দুর্দম মানসিকতা থাকলে, কতটা উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস থাকলে—একটি-দুটি নয়, প্রায় ৭০টি জলজ যান (যুদ্ধজাহাজ) ডাঙায় চালিয়ে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার মতো দুঃসাধ্য কাজ করা যায়, তারই নিদারুণ উপমা সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ রহিমাহুল্লাহর এ-ঘটনা!

[তথ্যসূত্র : সালিম আর-রশিদী, মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ : ১/১০৫ (তৃতীয় সংস্করণ, মাকতাবাতুল ইরশাদ, জেদ্দা, সৌদি আরব।); জন জুলিয়াস, আ শর্ট হিস্টরি অব বাইজান্টিয়াম (A Short History of Byzantium), পৃষ্ঠা : ৩৭৬। (Vintage Books, New York, USA)] –সম্পাদক

লোকেরা—যারা নিজেরাই নিজেদের কাজের ব্যবস্থা করে নেয়। বাকিরা হলো শাব্দিক অর্থে কাজের লোক; পারিভাষিক অর্থে নয়।

সফল ব্যক্তিদের কাজ

কাজ আবার তিন প্রকার—

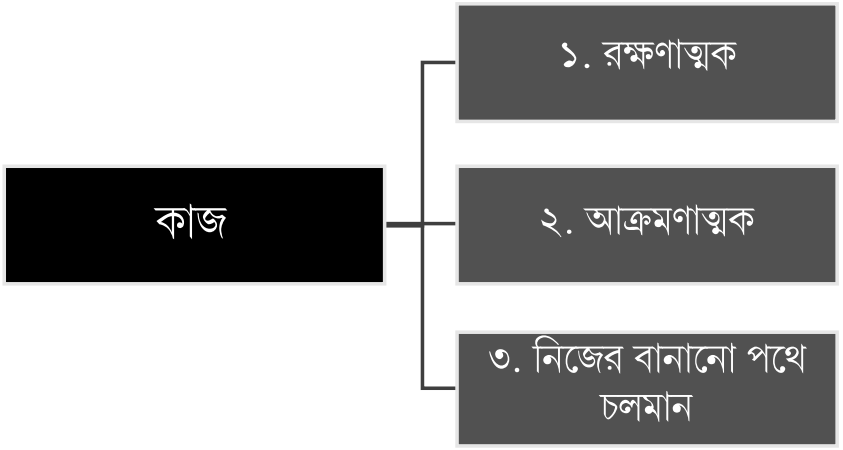

সফল ব্যক্তিরা মূলত তৃতীয় প্রকারের কাজটি করে থাকেন। অর্থাৎ, তারা একটা বার্তা নিয়ে এগিয়ে যান। তবে যখন কোনো বাধা আসে, তখন রক্ষণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সেটা তাদের মূল কাজ নয়; কাজকে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতিমাত্র। আবার কখনও কাজের পথ রুদ্ধ থাকে। তখন তাদেরকে আক্রমণের পথে যেতে হয়। তাদের মূল কাজ ও কাজের পদ্ধতি আসলে একটাই। মাঝখানে বাকি দুটোর কোনো একটা কেবল করার প্রয়োজন পড়লেই করেন। সেটাকে যেমন তারা মূল কাজ মনে করেন না, সেটা করতে পেরে আবার নিজেদের সফলও মনে করেন না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মূল কাজে মনোযোগী হয়ে সেটার ফলাফল বের করে আনার প্রতিই থাকে মুখ্য প্রচেষ্টা।

প্রথম দুই প্রকারের কাজকে যারা মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেয়, তারা প্রথমেই পথ হারিয়ে ফেলে। তাই মনে রাখতে হবে, সাফল্য কোনো ভুল পথের শেষে পৌঁছার নাম নয়।

স্থায়ী উদ্যমহীনতার কারণ ও প্রতিকার

১. লক্ষ্য স্থির না থাকা

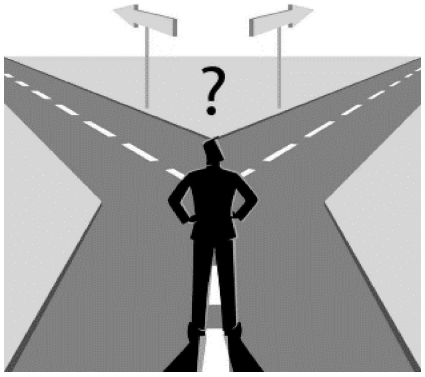

উদ্যমহীনতার একটা কারণ হলো, লক্ষ্য ছাড়া কাজ করতে থাকা। যে-কাজের লক্ষ্য থাকে না, সে-কাজের প্রতি উদ্যমী থাকাটাই বোকামির পরিচায়ক। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি অজানা-অচেনা পথে খুব আগ্রহ নিয়ে দুর্বার গতিতে চলতে পারে না। কাজে উদ্যম পেতে হলে প্রথমে লক্ষ্য ঠিক করতে হয়।

২. উদ্দিষ্ট কাজের প্রয়োজন ও চাহিদা কমে যাওয়া

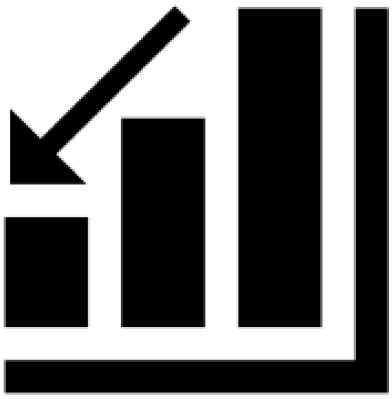

এমন কোনো কাজ নির্ধারণ করা ঠিক নয়, যার প্রয়োজনীয়তা কমে এসেছে, বা একেবারে ফুরিয়ে গেছে। যখনই বিষয়টি জানা যাবে, সাথে সাথে বিষয় বদলে ফেলা উচিত। এতে করে প্রয়োজনীয় বিষয়ে হাত দেওয়া যাবে। উদ্যমও ফিরে আসবে। কোনো প্রয়োজন নেই এমন কাজে লেগে থেকে সেটার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর অপচেষ্টা চালানো ক্ষতিকর।

৩. অন্যের সফলতা দেখে বিষয় নির্ধারণ করা

কোনো কোনো বিষয় আছে, যেটার প্রতি একজনের আগ্রহ থাকলেও অন্যের মানসিকতা সেটাকে গ্রহণ করে না। আবার মেধা ও প্রতিভার তারতম্য কাজের সহজতা ও কাঠিন্যে প্রভাব রাখে। তাই দেখা যায়, কেউ কেউ অন্যের সফলতা দেখে বিষয় ঠিক করে নেয়। পরে মাঝপথে নিজের সাধ্যের ঘাটতির কারণে,

আমরা সফল হতে পারি না, কারণ আমরা কিছু না করেও নিজেকে কর্মঠ ভাবি। তুচ্ছতাকে শ্রেষ্ঠত্ব মনে করি। গল্পকে বাস্তবতা ধরে নিই। এজন্য আমাদের রাজ্য না থাকলেও রাজার অভাব নেই। জাহাজ না থাকলেও নাবিকের অভাব নেই। কিন্তু রাজ্য ছাড়া রাজা আর জাহাজ ছাড়া নাবিকের অস্তিত্ব এ-পৃথিবী মেনে নেয় না। তাই দিনশেষে আমরা দেউলিয়াই থেকে যাই।

কিছু হওয়া বনাম কিছু করা

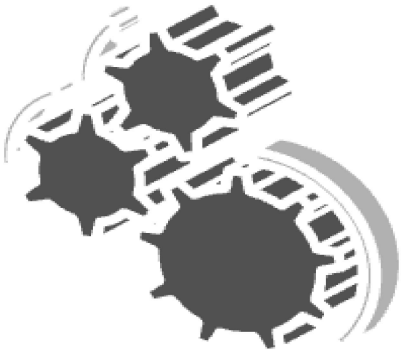

আমাদের একটা মারাত্মক ভুল হলো, আমরা কিছু হতে চাই; কিছু করতে চাই না। প্রথমে আমাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়—লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। তাই আমরা গাড়ি চড়তে চাই, অর্থাৎ গাড়ির যাত্রী হতে চাই। গাড়ি চালাতে চাই না। গাড়ি তৈরি করার কথা ভাবনায়ও আনি না।

এই যে কিছু হওয়ার প্রবণতা, এটা আমাদের কর্মঠ হতে দেয় না। পুরো জাতিই এ পঙ্গুত্ব বরণ করে আছে। তারা সেই কিছু হওয়ার জন্য কিছু করা থেকে দূরে থাকে। এর বিপরীতে 'হওয়া'কে ভুলে গিয়ে 'করার' পেছনে যারা শ্রম দেয়, তারা তাদের কর্ম ও কীর্তি রেখে যায়।

আমরা বানানো ভবনের বসবাসকারী হই। ভবনের নির্মাতা হই না। তৈরিকৃত যন্ত্রের ব্যবহারকারী হই, প্রস্তুতকারী হই না। আমরা কিছুর উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক হতে পারি না; ভোক্তা ও ভোগকারী হই।

সমস্যা সৃষ্টিকারী কয়েক শ্রেণির মানুষ

কয়েক ধরনের মানুষ আছে, যারা সমস্যা তৈরি করে। তাদের মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য কমন—

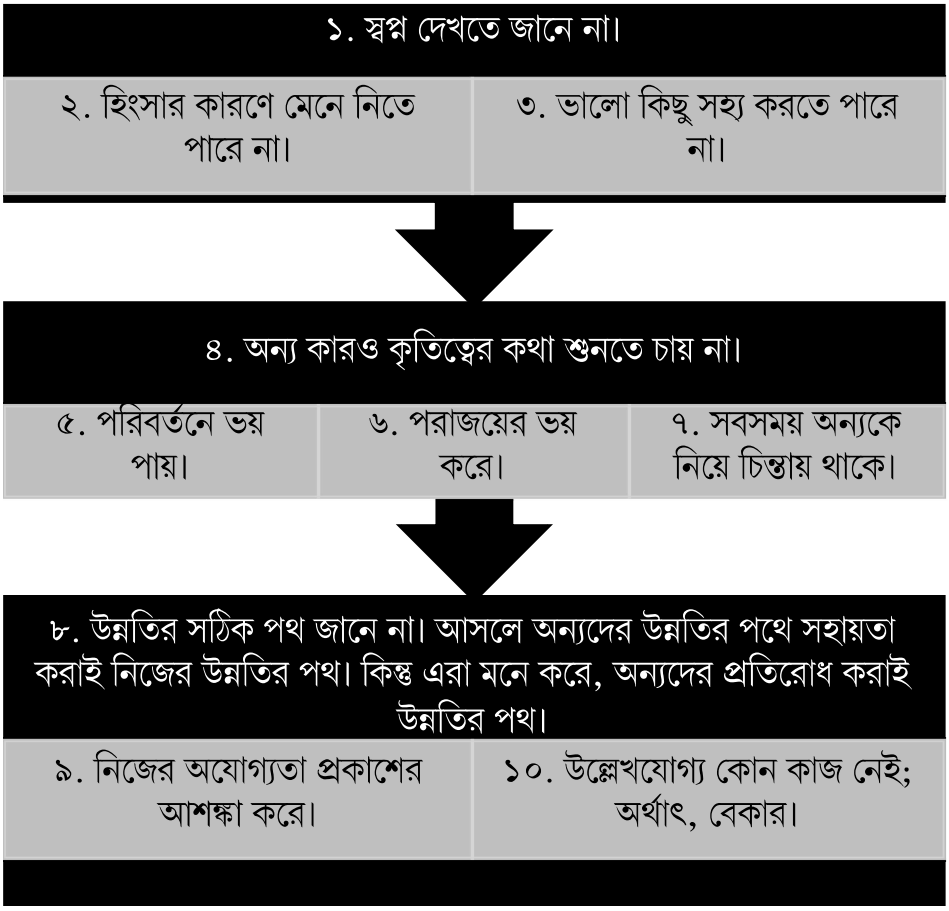

এ-সমস্ত মানুষের কারণে কি তুমি হাল ছেড়ে দেবে? ওরা তো এসব রোগের কথা কস্মিনকালেও স্বীকার করবে না। এখন তোমার উচিত হবে, কাজের গতি বাড়িয়ে দেওয়া। যাতে ওরা তোমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়।

বসন্তের সাথে শরৎ অবশ্যই থাকে।

এ-কারণে কিছুতেই ভাটাকে পতন মনে না করে, জোয়ারের পথ চেয়ে থাকবে। হাল ছেড়ে দেওয়াই প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতা; খরা কিংবা ভাটা আসা নয়।

মেঘ দেখে কখনও ভয় করতে নেই। অবশ্যই তার আড়ালে সূর্য হাসছে।

মানুষকে জানা

তুমি যদি মানুষকে জানতে না পারো, বুঝতে না পারো—তাহলে মানুষের সাথে চলতে গিয়ে তোমার সকল সুখ-শান্তি হারিয়ে ফেলবে।

সমাজে কিছু মানুষ থাকে পরশ্রীকাতর। তারা যে-কারও ভালো দেখলে কষ্ট পায়। প্রথমেই মুখের হাতিয়ার ব্যবহার করে।

তারা তাদের পরশ্রীকাতরতার পরিমাণ অনুযায়ী বাক্য ব্যয় করবে। সেটা তোমার গায়ে লাগতে দেবে কেন? তাদের কথা তো তাদের রোগের পরিমাণ বোঝাচ্ছে। সেটা নিয়ে তাদের নিজেদের ভাবা উচিত।

এমন মানুষ বিভিন্ন পদক্ষেপও নিতে পারে। তাতে বিচলিত হবে না। বরং, মনে রাখবে, মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ দু'ধরনের—

সাধারণত ব্যক্তি নিজে দায়িত্ব নিয়ে এগুলো চিহ্নিত করে। ভালোগুলোকে ধারণ করে। মন্দগুলোকে বর্জন করে। তবে সেটা নির্ভর করে তার সদিচ্ছার